# অধ্যায় - ৩৮

*বাবার হাঁড়ি, দেবমূর্তির উপেক্ষা, নৈবেদ্য বিতরণ, ঘোলের প্রসাদ।*

গত অধ্যায়ে চাওড়ী সমারোহ বর্ণনা করা হয়েছিল। এবার এই অধ্যায়ে বাবার খাবার তৈরি করার হাঁড়ি ও কয়েকটি অন্য বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

**প্রস্তাবনা ঃ-**

হে সদগুরু সাই! তুমি ধন্য! তোমাকে আমরা প্রণাম করি। তুমিই সমগ্র বিশ্বকে সুখ দিয়েছ এবং ভক্তদের মঙ্গল করেছ। তোমার হৃদয় উদার। যে ভক্তরা তোমার অভয় চরণকমলে নিজেদের সমর্পিত করে দেয়, তুমি তাদের সর্বদা রক্ষা এবং উদ্ধার করো। ভক্তদের কল্যাণ ও পরিত্রাণ নিমিত্তেই তোমার এই পৃথিবীতে অবতারণা হয়েছে। ব্রহ্মের ছাঁচে শুদ্ধ আত্মারূপী দ্রব্য ঢালা হয় এবং তার থেকে যে মূর্তি বেরোয় সেইটিই সন্তচূড়ামণি শ্রী সাইবাবা। তিনি স্বয়ং 'আত্মারাম", চির আনন্দধাম। এই জীবনের সমস্ত কার্য্যকলাপ নশ্বর জেনে তিনি ভক্তদের নিষ্কাম ও মুক্ত করেছেন।

**বাবার হাঁড়ি ঃ-**

মানব ধর্ম শাস্ত্রে বিভিন্ন যুগ অনুসারে বিভিন্ন সাধনা উল্লেখ করা হয়েছে। **সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানের বিশেষ মাহাত্ম্য বলা হয়। সব রকমের দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ মানা হয়।** দুপুরবেলা খাবার না পেয়ে আমরা সহজেই বিচলিত হয়ে উঠি। এমনিই অবস্থা অন্যান্য প্রাণীদেরও হয়। তাই কোন ভিক্ষুক বা ক্ষুধার্তকে যে খাবার দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ দানী। তৈত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে- "অন্নই ব্রহ্ম এবং তার থেকেই সব প্রাণীদের উৎপত্তি। তার সাহায্যেই সবাই জীবিত থাকে এবং মৃত্যুর পর তাতেই লয় হয়।" কোন অতিথি দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে আসলে আমাদের এটাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে খেতে অনুরোধ করি। অন্যান্য দান যেমন ধন, ভূমি, বস্ত্র ইত্যাদি দেওয়ার সময় পাত্রতা বিচার করতে হয়। কিন্তু অন্ন দানের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। দুপুরবেলা যে আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায় তাকে শীঘ্র ভোজন করানো

আমাদের পরম কর্তব্য। প্রথমে পঙ্গু, অন্ধ বা রুগ্ন ভিখিরিদের, তারপর শক্ত-সমর্থ লোকেদের এবং এদের সবার পরে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের পরিবেশন করাটাই উচিত। বাকী সবার চেয়ে পঙ্গুদের খাওয়ানোর মাহাত্ম্য বেশী। অন্নদান ছাড়া অন্য সব প্রকারের দান তেমনি অসম্পূর্ণ যেমন চাঁদ ছাড়া তারা, কলশ ছাড়া মন্দির, পদ্ম ফুলহীন পুকুর, ভক্তিরহিত ভজন, সিঁদূরবিহীন সধবা, মধুরস্বরহীন গান, নুন ছাড়া খাবার। যেমন অন্যান্য খাদ্য পদার্থের মধ্যে ডাল উত্তম মানা হয় তেমনিই সমস্ত দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ। এবার দেখা যাক্ বাবা কি ভাবে খাবার তৈরী করে সেটা বিতরণ করাতেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাবা অল্পাহারী ছিলেন। একটু-আধটু যা খেতেন, সেটা তিনি দু-একটা বাড়ী থেকে যা ভিক্ষে পেতেন, তাতেই পুরো হয়ে যেতো। কিন্তু যখন তাঁর সব ভক্তদের খাবার খাওয়াবার ইচ্ছে হত তখন শুরু থেকে নিয়ে শেষ অবধি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতেন। তিনি কারো উপর নির্ভর করতেন না আর কাউকে এ বিষয়ে কষ্টও দিতেন না। এমন কি পেষার কাজও তিনি নিজেই করতেন। প্রথমে নিজে বাজার গিয়ে সব জিনিষ যেমন ডাল, চাল, আটা, নুন লঙ্কা, জীরে, নারকেল এবং অন্যান্য মশলা নগদ দাম দিয়ে কিনে আনতেন। মস্‌জিদের খোলা উঠোনে উনুন বানিয়ে (চুলা) তাতে আগুন ধরাতেন। হাঁড়িতে ঠিক পরিমাণে জল ভরতেন। দুটো হাঁড়ি ছিল। একটা ছোট ও অন্যটা বড়। একটাতে একশো ও অন্যটাতে পাঁচশো লোকের খাবার তৈরী হত। কখনো তিনি মিষ্টি পোলাও বানাতেন ও কখনো মাংস মেশানো পোলাও (নান্‌তা পোলাও)। কখনো-কখনো ডালও বানাতেন। শিলে মিহি করে মশলা পিষে হাঁড়িতে ঢালতেন। খাবার যাতে সুস্বাদু হয় সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। জোওয়ারের আটার জলে অম্বল তৈরী করে খাবারের সময় ভক্তদের সমান মাত্রায় পরিবেশন করতেন। খাবার ঠিক তৈরী হয়েছে কিনা সেটা দেখবার জন্য নিজের কফ্‌নীর আস্তিন গুটিয়ে নির্ভয়ে ফুটন্ত হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করতেন। এতে তাঁর হাতে কোন পোড়ার দাগ বা ফোস্‌কা পড়ত না আর মুখেও কোন ব্যথার চিহ্ন দেখা যেতো না। খাবার তৈরী হয়ে গেলে মস্‌জিদ থেকে পাত্র আনিয়ে মৌলবীকে 'ফাতিহা' পড়তে বলতেন। তারপর তিনি মহালসাপতি ও তাত্‌য়া পাটীলের প্রসাদের ভাগ আলাদা রেখে বাকীটা গরীব ও অনাথ লোকেদের খাইয়ে তাদের তৃপ্ত করতেন। সত্যি ওরা ধন্য। বাবার তৈরী করা সেই খাবার তাঁরই হাতে যাঁরা খেতে পেয়েছিলেন তাঁরা সত্যিই ধন্য ও ভাগ্যবান। এবার অনেকে ভাবতে পারে যে তিনি কি নিরামিষ এবং আমিষ খাদ্য পদার্থর প্রসাদ হিসেবে একই সঙ্গে বিতরণ করতেন? এর উত্তর একদম সরল ও সোজা। যারা আমিষ খেত তাদের

হাঁড়ি থেকেই প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হত এবং অন্যদের সেটা স্পর্শও করতে দিতেন না। তিনি কাউকে কখনো আমিষ খাবার খেতে উৎসাহিত করেননি এবং তাঁর কখনোই এই ইচ্ছে ছিল না যে এটা কারো অভ্যাস হয়ে দাঁড়াক। এটা একটা খুব পুরনো নিয়ম যে যখন গুরুদেব প্রসাদ বিতরণ করেন তখন যদি শিষ্য সেটা গ্রহন করতে সন্দেহ বা দ্বিধা বোধ করে তাহলে তাঁর অধঃপতন ঘটে। এই নীতি ভক্তরা কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছে তা জানবার জন্য বাবা মাঝে-মাঝে পরীক্ষা করতেন। একবার একাদশীর দিন তিনি দাদা কেলকরকে কিছু টাকা দিয়ে মাংস কিনে আনতে বলেন। দাদা কেলকর ছিলেন প্রকৃত কর্মকাণ্ডী এবং প্রায় সব নিয়মগুলিই পালন করতেন। ওঁর এই দৃঢ় মত ছিল যে দ্রব্য, অন্ন এবং বস্ত্র ইত্যাদি গুরুকে অর্পণ করা পর্যাপ্ত নয়। তাঁর আদেশ শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করলেই তিনি প্রসন্ন হন। এটাই তাঁর দক্ষিণা। দাদা তক্ষুনি কাপড় পরে একটা থলে নিয়ে বাজার যেতে উদ্যত হন। তখন বাবা ওঁকে ফেরত ডেকে বলেন- "তুমি যেও না, অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও।" তখন দাদা নিজের চাকর পাণ্ডুকে পাঠান। ওকে যেতে দেখে বাবা ওকেও ফেরত ডেকে এই কাজটা স্থগিত করে দেন।

আরেকবার তিনি দাদাকে বলেন- "দেখো তো নোনতা পোলাও-য়ের স্বাদটা ঠিক আছে কি না।" দাদা না দেখেই বলেন- "ভালো, ঠিক আছে।" তখন বাবা ওকে বলেন- "তুমি ত ভালো করে চোখ দিয়ে দেখলে না, জিভ দিয়ে একটু চাখলেও না। তাহলে কি করে বলছ যে খুব ভালো হয়েছে? একটু ঢাকনাটা সরিয়ে দেখো।" বাবা দাদার হাত ধরে জোর করে পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে বলেন- "নিজের গোঁড়ামি ছেড়ে একটু চেখে দেখো।" যখন মায়ের প্রকৃত প্রেম সন্তানের উপর উপছে পড়ে তখন মা তাকে চিমটিও কাটেন। কিন্তু সন্তানের চেঁচান বা কান্না দেখে শুনে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এই ভাবেই বাবা সাত্বিক মাতৃ-প্রেমের বশীভূত হয়েই দাদার এইরূপ হাত ধরেন। কোন সন্ত বা গুরু নিজের কর্মকাণ্ডী শিষ্যকে বর্জিত ভোজনের জন্য আগ্রহ করে নিজের অপকীর্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন না।

এইভাবে এই হাঁড়ির পরম্পরা ১৯১০ সাল পর্যন্ত চলে এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায়। একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে দাসগণু নিজের কীর্তনের মাধ্যমে সমস্ত বম্বে প্রদেশে বাবার কীর্তি দূরদূরান্তে প্রচার করেন। তাই এই প্রান্ত থেকে লোকেদের দল শিরডী আসতে শুরু করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই শিরডী পবিত্র তীর্থস্থলে পরিণত হয়। ভক্তরা নৈবেদ্য রূপে বাবার জন্য নানা রকমের সুস্বাদু ব্যঞ্জন আনত। সেগুলি

এত বেশী মাত্রায় জড়ো হয়ে যেত যে ফকিরদের ও ভিখিরীদের পেট ভরে খাওয়ানোর পরও বেঁচে যেত। নৈবেদ্য বিতরণের বিধি বর্ণনা করার আগে আমরা নানাসাহেব চাঁদোরকরের ঐ কথাটি বর্ণনা করব যেটি স্থানীয় দেবী-দেবতাদের ও মূর্তির প্রতি বাবার সম্মান -ভাবনার দ্যোতক।

### নানাসাহেব দ্বারা দেবমূর্তির উপেক্ষা ঃ-

কিছু লোক নিজেদের কল্পনা অনুসারে বাবাকে ব্রাহ্মণ এবং কিছু তাঁকে মুসলমান বলে মানতো। কিন্তু আসলে তাঁর কোন জাতি ছিল না। তাঁর এবং ঈশ্বরের কেবল একটাই জাতি। কেউই নিশ্চিত রূপে এটা জানতে পারেনি যে তিনি কোন কুলে জন্মান এবং তাঁর মা-বাবা কে ছিলেন? তবে তাঁকে হিন্দু বা মুসলমান বলে কি করে ঘোষণা করা যেতে পারে? যদি তাঁকে মুসলমান বলা হয় তাহলে মস্‌জিদে সব সময় 'ধুনি' এবং তুলসী বৃন্দাবন কেন রাখতেন এবং শঙ্খ, ঘন্টা ও অন্য বাদ্যযন্ত্র কেনই বা বাজতে দিতেন? হিন্দুদের বিভিন্ন রকমের পূজো কেন স্বীকার করতেন? যদি সত্যি তিনি মুসলমান ছিলেন তাহলে ওঁর কানে ফুটো কেন ছিল এবং হিন্দু মন্দিরগুলির জীর্ণতা সংস্কার কেন করিয়ে ছিলেন? তিনি হিন্দুদের মূর্তি পূজো বা দেবী-দেবতাদের এতটুকু উপেক্ষা কখনো সহ্য করেন নি।

একবার নানাসাহেব চাঁদোরকর নিজের ভায়রা ভাই শ্রী বিণীবলের সাথে শিরডী আসেন। যখন তাঁরা মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছন, বাবা কথা বলতে বলতে হঠাৎ রেগে গিয়ে বলেন- "তুমি দীর্ঘকাল থেকে আমার সঙ্গে রয়েছো, তবে এই ধরনের ব্যবহার কেন করো?" নানাসাহেব প্রথমে এই কথার অর্থ বুঝতে পারেন না। অতএব বিনীতভাবে তাঁর অপরাধ বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে বাবা বললেন- "তুমি কখন কোপরগ্রাম এলে এবং তারপর ওখান থেকে কেমন করে শিরডী পৌঁছলে?" নানাসাহেব নিজের ভুল অবিলম্বে বুঝতে পারেন। ওঁর একটা নিয়ম ছিল যে শিরডী আসার আগে উনি কোপরগ্রামে গোদাবরীর তীরে শ্রীদত্তাত্রেয়ের মন্দিরে পূজো করতেন। কিন্তু সেবার একটি বিশেষ কারণে, ঐ আত্মীয় দত্ত উপাসক হওয়া সত্ত্বেও- ওঁকে হতোৎসাহিত করে, দুজনে সোজা শিরডী এসে পৌঁছন। নিজের দোষ স্বীকার করে উনি বলেন- "গোদাবরীতে স্নান করার সময় পায়ে একটা বড় কাঁটা ফুঁটে যায়। খুব কষ্ট হচ্ছিল।" বাবা বললেন- "এটা তো তোমার ভুলের খুব ছোট্ট শাস্তি।" ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সজাগ থাকতে বাবা তাঁকে সাবধান করেন।

নৈবেদ্য বিতরণ ঃ-

এবার আমরা নৈবেদ্য বিতরণের দৃশ্য বর্ণনা করব। আরতি শেষ হওয়ার পর বাবার আশীর্বাদ ও উদী নিয়ে যখন ভক্তরা নিজের-নিজের বাড়ী চলে যেত তখন বাবা পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে খাবার খাওয়ার জন্য আসন গ্রহণ করতেন। ভক্তদের দুটো সারি ওঁর কাছে বসত। যারা নৈবেদ্য নিয়ে আসত তারা নানা প্রকারের খাবার যেমন- লুচি, পেঁড়া, বর্ফী, ভাত ইত্যাদি থালায় সাজিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিত। তারপর বাইরেই প্রতীক্ষা করত প্রসাদের জন্য। সমস্ত রকম খাবার একসঙ্গে মিশিয়ে বাবার সামনে রাখা হত। বাবা সম্পূর্ণটা ভগবানকে উৎসর্গ করে স্বয়ং গ্রহণ করতেন। তার থেকে খানিকটা বাইরে অপেক্ষামান ভক্তদের দিয়ে বাকীটা ভিতরের ভক্তদের পরিবেশন করা হতো। বাবা সবার মাঝে এসে বসলে ভক্তরা প্রাণ ভরে খেত। ভিতরের সবাইকে রোজ এই প্রসাদ পরিবেশন করে খাওয়ানোর ভার এবং তাদের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব শামা ও নিমোনকরের উপর বাবা ন্যস্ত করেছিলেন। ওঁরা এই কাজটি বড় উৎসাহ ও যত্ন সহকারে সম্পন্ন করতেন। এই ভাবে পাওয়া প্রত্যেক গ্রাস ভক্তদের দিত দৈহিক পুষ্টি ও মনের সন্তোষ। কত সুস্বাদু, পবিত্র ও প্রেমরসপূর্ণ ছিল সেই প্রসাদান্ন।

ঘোলের প্রসাদ ঃ-

এই সৎসঙ্গে বসে একবার যখন হেমাডপন্ত পেট ভরে খাবার খেয়ে নিয়েছেন সেই সময় বাবা ওঁকে এক পেয়ালা ঘোল খেতে দেন। তার সাদা রঙ ওঁকে প্রফুল্লিত করে, কিন্তু পেটে এতটুকু জায়গা ছিল না। তাই কেবল এক চুমুক খেয়ে দেখলেন। ওঁর এই ধরনের উপেক্ষা দেখে বাবা বলেন- "সবটা খেয়ে নাও। এর পর এই সুযোগ আর আসবে না।" তখন উনি পুরো ঘোলটা খেয়ে নেন। হেমাডপন্ত বাবার সাংকেতিক নির্দেশের অর্থ শীঘ্রই বুঝতে পারেন! কারণ এই ঘটনার কিছুদিন পরই বাবা সমাধিস্থ হন। পাঠকবৃন্দ! আমাদের হেমাডপন্তের প্রতি নিশ্চয় কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। তিনি এক পেয়ালা ঘোলই পান করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তে আমাদের জন্য রেখে গেছেন বাবার লীলামৃত- যা পেয়ালার পর পেয়ালা পান করেও শেষ হয় না।

*।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।*